যাঁদের কাছে পড়েছি

ভবতোষ দত্ত*

আজ থেকে প্রায় ৫৬ বছর আগে ১৯২৮- এর জুলাই মাসে যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকলাম, তখন মনে ছিল একটা মিশ্র অনুভূতি— সঙ্কোচ ভয় এবং গর্বের। গর্বটা স্বাভাবিক, কারণ ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি বাংলা দেশের যত জ্ঞানীগুণী সবাই এই কলেজের ছাত্র। সঙ্কোচেরও কারণ ছিল, বিশেষত মফঃস্বল থেকে আসা ছাত্রের পক্ষে। তা'ছাড়া, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ/আই-এস্ সি পাশ করে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হবার আভিজাত্য আমার ছিল না, কলকাতার ছেলেদের কাছে আমার মত ঢাকা বোর্ডের পাশ করা ছেলেরা একেবারেই ব্রাত্য। সঙ্কোচটা কাটতে অবশ্য বেশি দিন লাগে নি, কারণ ইডেন হিন্দু হোস্টেলে প্রথম থেকেই কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু পেয়ে গেলাম। তাদের সাহায্যে এবং সাহচর্যে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কলেজ-জীবন সহজ হয়ে এল। আরো নতুন বন্ধু পেলাম এবং শিক্ষকদের কাছাকাছি আসবার সুযোগ পেলাম।

অর্থনীতি বিভাগে তখন তিনজন মাত্র অধ্যাপক। বিভাগীয় প্রধান ছিলেন দেশ-বিশ্রুত স্যার জাহাঙ্গীর কয়াজী। অল্পকিছুদিন আগে হিলটন-ইয়ং কমিশনের কাজ করে ফিরে এসেছেন এবং সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এর আগে প্রেসিডেন্সি কলেজের আরো দু'জন ভারতীয় অধ্যাপক 'নাইট' হয়েছিলেন—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়— কিন্তু তাঁরা সম্মান পেয়েছিলেন অবসর গ্রহণের পরে। কলেজে কাজ করতে করতেই 'নাইট' হয়েছিলেন একমাত্র কয়াজী সাহেব। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে প্রথম কয়েক মাস কয়াজী সাহেব পড়াতেন না— আমরা দূর থেকে দুই হাতে বই-বোঝাই অবিন্যস্ত পোষাক-পরা বিশাল গুম্ফ-যুক্ত মূর্তি স-সম্ভ্রমে দেখতাম, আর তাঁর আত্মভোলা প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনতাম।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর শেষের দিকে কয়াজী সাহেব আমাদের পড়াতে আরম্ভ করলেন। জটিল জিনিসকে সহজতম আকারে উপস্থিত করতে তাঁর জুড়ি ছিল না। দু'একটির বেশি বই-য়ের নাম করতেন না— বলতেন মার্শাল আর টাউসিগ ভাল করে পড়লে আর কিছু পড়ার দরকার হবে না। এখন মনে হয় তিনি একটু বেশি প্রাচীনপন্থী ছিলেন, কিন্তু তখন এদেশে এবং বিদেশে সর্বত্রই মার্শালের একচ্ছত্র আধিপত্য। মাঝে মাঝে ছোট ছোট তিন চার লাইনের নোট লিখে নিতে বলতেন— সেগুলি তাঁর সমস্ত বক্তব্যের সারমর্ম অনবদ্য ভাবে প্রকাশ করত।

সহজভাবে গল্প করার মতো পড়াতেন, কিন্তু ছাত্রদের কাউকে ব্যক্তিগত-ভাবে জানবার চেষ্টা কখনো করেন নি। এ নিয়ে অনেক মজার গল্প কলেজে চালু ছিল। যখন কয়াজী সাহেব কিছুদিনের জন্য কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন তখন একটি রসায়নের ছাত্র তাঁর কাছে যায় একটি সার্টিফিকেটের জন্য। অমায়িক অধ্যক্ষ ছাত্রটির নামটা জিজ্ঞাসা করে দুই মিনিটে একটি সার্টিফিকেট লিখে দিলেন। ঘরের বাইরে এসে ছাত্রটি দেখে যে কয়াজী সাহেব তাকে অর্থনীতির একটি বিশিষ্ট ছাত্র বলে বর্ণনা করে দিয়েছেন। একবার আমাদের ক্লাসে জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের মধ্যে ক'জন ইন্টারমিডিয়েটে প্রথম ডিভিশনে পাশ করেছো? আমরা সবাই দাঁড়িয়ে ওঠাতে চমৎকৃত অধ্যাপক বললেন যে এমন ভাল ক্লাস তিনি আগে কখনো পান নি। প্রথম বিভাগে পাশ না করলে যে এই কলেজে ভর্তিই হওয়া যায় না সেটা তাঁর খেয়াল ছিল না। আর একবার একটি ছেলে বি-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পেয়ে দুঃখ করছে দেখে

*প্রাক্তন ছাত্র ১৯২৮-৩২(অর্থনীতি)

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

বলেছিলেন, তাতে কী হয়েছে, আর একবার পরীক্ষা দাও— নিশ্চয় প্রথম শ্রেণী পেয়ে যাবে। পরীক্ষায় পাশ করলে যে সেটা আবার দেওয়া যায় না, কয়াজী সাহেব সেটা জানতেনই না।

অন্য দুজন অধ্যাপকের মধ্যে প্রবীণতর ছিলেন অধ্যাপক পঞ্চাননদাস মুখোপাধ্যায়। ধীর শান্ত মূর্তি, কথা বলতেন আস্তে আস্তে এবং অনেক নোট দিতেন। পড়াতেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং বিশেষত আরিস্‌ততল। বহু দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সার সংগ্রহ করে নোট তৈরি করতেন এবং আমরা খুবই উপকৃত হতাম। আমাদের পূর্ববর্তী একজন ছাত্র একবার কলেজের শিক্ষকদের নিয়ে একটা ছড়া লিখেছিলেন— তাতে ছিল 'পঞ্চমুখে পঞ্চানন নোট করে বিতরণ'। আমরা বেশিদিন তাঁর কাছে পড়তে পারি নি। প্রথম বছরের পুজার ছুটির পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তা থেকে আর আরোগ্য লাভ করেন নি। আমরা খুবই বিচলিত হয়েছিলাম।

পঞ্চাননবাবু যদি নোট বিতরণে পঞ্চানন ছিলেন, তাহলে দশানন ছিলেন দুর্গাগতি চট্টরাজ। সারা ঘন্টা দুর্বার গতিতে নোট দিয়ে চলতেন। আমরা দ্রুত গতিতে লিখে চলতাম,কী লিখতাম সেটা ভেবে দেখার সময় থাকত না। মাঝে মাঝে নোটের সঙ্গে অন্য মন্তব্যও থাকত— লেখার 'মোমেন্টাম'-এ আমরা সবই লিখে ফেলতাম।

একবার দেখি লিখে এনেছি 'Out of Renaissance sovereignty combined with revolutionary rights came nationalism and my friend in the last bench will do well not to disturb the class' —কী করে সব দেখতেন বুঝতে পারতাম না, কারণ আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত নোট খাতার উপরে এবং অধ্যাপক চট্টরাজ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন ঘরের ছাতের দক্ষিণ পশ্চিম কোণার দিকে। গল্প শুনতাম, প্রথম জীবনে তিনি নাকি একটি মেয়েদের কলেজে কাজ করেছিলেন। মেয়েদের মুখের দিকে তাকানো অশালীন হবে মনে করে ছাতের দিকে তাকিয়ে পড়ানো অভ্যাস করেছিলেন। এটা নেহাৎ-ই গল্প। কারণ তিনি কখনো কোনো মেয়েদের কলেজে পড়ান নি।

বাহ্যিক আবরণে একটু রূঢ় হলেও তাঁর ভিতরে যে একটি পরম স্নেহশীল মন ছিল তার পরিচয় পেয়েছিলাম পরে যখন তিনি ইডেন হিন্দু হস্টেলে সুপারিনটেনডেন্ট হয়ে আসেন। তিনি জনপ্রিয় ছিলেন একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে, কিন্তু আমাদের কয়েকজনকে তিনি অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন। এম-এ পরীক্ষা দেবার সময় আমার থাকার জায়গা ছিল না। একজন সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট-এর ঘরটা খালি ছিল, সেখানে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। দু'বেলা তাঁর বাড়ী থেকে খাবার আসতো— আমার ক্ষীণদেহের পক্ষে যা অতি প্রচুরেরও অধিক। এম-এ পরীক্ষার ছ'টা পেপার হয়ে যাবার পরে আমার একটু সর্দি জ্বর হয়। অধ্যাপক চট্টরাজ সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আনলেন এবং নিজে বসে থেকে আমাকে দিয়ে তখনকার দিনের প্রচলিত 'ফুট-বাথ' নেওয়ালেন। রাত দশটার পরে আমার জ্বর ছেড়ে যাবার পরে উঠলেন। কলেজের বহু ছাত্র তাঁর এদিকটা জানতো না।

আরো দু'জন অধ্যাপকের কাছে আমরা অল্পসময়ের জন্য পড়েছিলাম। কয়াজী সাহেব একবার বিদেশে গেলে, তাঁর জায়গায় পড়াতে এলেন নতুন পাশ-করা অরুণকুমার সেন (যিনি পরে সিটি কলেজ-সমষ্টির সর্বাধ্যক্ষ হয়ে ছিলেন)। অরুণবাবু আমাদের চেয়ে মাত্র চার বছরের বড় কিন্তু ক্লাসে আমরা তাঁর বক্তব্য সযত্নে শুনতাম এবং তিনিও খুব যত্ন নিয়ে পড়াতেন। আর পড়েছি অধ্যাপক অক্ষয় কুমার সরকারের কাছে। তিনি ক্লাসে একটু অস্বস্তি বোধ করতেন এবং ছেলেরা সেটার সুযোগ নিত। তিনি কিছুতেই ব্ল্যাক বোর্ডে যেতেন না এবং আমরা জোর করতে থাকতাম যে জিনিসটা ছবি এঁকে বুঝিয়ে না দিলে চলবে না। মাঝে মাঝে তর্জনী দিয়ে হাওয়ার উপরে দু'একটা রেখা আঁকতেন, কিন্তু তাঁর চোখে যেটা বাঁ দিক আমাদের চোখে সেটা ডান দিক হয়ে যাওয়াতে সবই ওলট -পালট হয়ে যেত।

অনার্স বিষয়ের বাইরে যে সব ক্লাস করতে হোত তার মধ্যে অবিস্মরণীয় অধ্যাপক প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের শেকস্‌পীয়র পড়ানো। আমাদের পাঠ্য ছিল 'ম্যাকবেথ' আর 'টেমপেস্‌ট'। 'ম্যাকবেথ'-এর ক্লাসে শেকস্‌পীয়রের ব্যবচ্ছেদ হোত, 'টেমপেস্‌ট'-এর ক্লাসে

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

হোত শেকস্‌পীয়রের প্রদীপ্ত আর্বিভাব। প্রফুল্লবাবুর অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও অগাধ পাণ্ডিত্যকে ছাপিয়ে উঠতো তাঁর অপূর্ব বাক্‌ভঙ্গী। যখন যে চরিত্রের জন্য যেমন দরকার তাঁর কণ্ঠে যখন তখন তারই ধ্বনি বেজে উঠতো। কাতর কণ্ঠে যখন মিরাণ্ডা বলছে, "If by your art, my dearest father, you have put the wild waters in this roar, allay them," তখন প্রস্পেরোর ম্যাজিক- এর চেয়ে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রফুল্লবাবুর কণ্ঠ-নিঃসৃত মোহজাল বিস্তার। পার্সিভ্যালকৃত টেমপেসটের সংস্করণ ছাপা হতে দেরি হচ্ছিল বলে প্রফুল্লবাবু আমাদের কিছুদিন বাড়তি বই হিসেবে A Midsummer Night's Dream পড়িয়েছিলেন। আমার কানে এখনো বাজে 'পাক' এর কলকণ্ঠের উক্তি "I'll put a girdle round about the earth/ In forty 'minutes." প্রফুল্লবাবুর কাছাকাছি আসতে পারেন এমন ইংরেজির অধ্যাপক আমি মাত্র আর একজন পেয়েছিলাম —ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ফণিভূষণ চক্রবর্তী। পরে তিনি অন্যতর ক্ষেত্রে শিখর দেশে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁর পড়ানো কন্‌রাড-এর 'ইয়ুথ' -এ তারুণ্যের ও সমুদ্রের যে স্বাদ পেয়েছিলাম তা এখনো ভুলিনি।

ইংরেজি পড়ানোতে আর একজন যিনি আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন তিনি সোমনাথ মৈত্র। ভাস্করের সৃষ্ট চেহারা ও পরিপাটি পোষাকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পরিচ্ছন্ন অধ্যাপন। তখন হিরণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এরও খুব নাম ছিল, কিন্তু তিনি আমাদের পড়াতেন না। সুবোধ সেনগুপ্ত আমাদের চতুর্থ বর্ষে কলেজে যোগদান করেন কিন্তু তাঁর কাছে পড়বার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। অধ্যক্ষ ব্যারো সাহেবের পড়ানো মনে কোনো দাগ কাটেনি—হয়তো বাইবেল পড়াতেন বলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল বাইবেলের নীরসতম অংশগুলি পাঠ্য হিসাবে নির্বাচিত করতে।

অন্য যে কয়েকজন অধ্যাপকের নাম বিশেষভাবে মনে পড়ে তাঁদের মধ্যে ছিলেন সদানন্দ ভাদুড়ী এবং গণিতে খগেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী। সদানন্দ বাবু গুরুগম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন—তাঁকে আমরা একটু ভয়ও করতাম, যেটা বাংলার অধ্যাপকেরা বিশেষ ভাবে পেতেন না। বিখ্যাত পণ্ডিত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভালমানুষীর সুযোগ নিয়ে তাঁর উপরে অনেক রকম অত্যাচার চলত। যাঁরা এই আচরণের নেতা ছিলেন তাঁদের নাম করতে চাই না—তাঁদের মধ্যে অন্তত দু'জন হাইকোর্টে মহামান্য বিচারপতি হয়েছিলেন। খগেনবাবু সবাইকে চিনতেন এবং ভালবাসতেন। পড়াতেন অতি সাবলীলভাবে। 'পাস'-এর বিষয়টাকে অবহেলা করা প্রেসিডেন্সি কলেজের চিরকালের রেওয়াজ— কিন্তু খগেনবাবু যা পড়িয়েছিলেন তা মনের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল।

যাঁদের কাছে পড়িনি তাঁদের সঙ্গেও যোগাযোগ হয়েছিল নানাভাবে। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় ইতিহাসের অধ্যাপক সুরেশ চন্দ্র মজুমদারের। তাঁর শেষ জীবনে একটা বিপর্যয় আসে এবং হয়তো সেই কারণেই তাঁর কথা কেউ মনে রাখেন নি। কিন্তু আমাদের সময়ে বহু ছাত্র ছিল যারা তাঁর দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়েছিল। আর জানতাম অধ্যাপক সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্তকে—দর্শনের অধ্যাপর রূপে নয়, 'রবীন্দ্র-পরিষৎ'-এর সভাপতি রূপে। তখনকার দিনে প্রেসিডেন্সি কলেজের সাংস্কৃতির জীবনে রবীন্দ্র-পরিষদের একটি বিশেষ স্থান ছিল। এই পরিষদের একটি রম্য ইতিহাস বোধহয় প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত এখনো লিখে দিতে পারেন। শ্রীকুমার বাবুর নেতৃত্বে একটি 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি'ও স্থাপিত হযেছিল— কিন্তু সেটা রবীন্দ্র-পরিষদের সমতুল্য হয়ে উঠতে পারেনি। কলেজ পত্রিকার সম্পাদক থাকা কালীন অনেক অধ্যাপকের কাছাকাছি এসেছিলাম— বিশেষত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যায় তাঁর ড্রেট রেটের নিবন্ধ থেকে কিছুটা অংশ ছাপবার অধিকার তিনি আমাদের সহজেই দিয়েছিলেন।

বার্ধক্যে উপনীত হয়ে স্মৃতির ভাণ্ডারের দিকে পিছন ফিরে তাকালে মনে হয় যে বলার মত কথার শেষ নেই। অনেক টুকরো স্মৃতি মনের মধ্যে উঁকি মারে। ধীর পদক্ষেপে ক্লাসে ঢুকে শ্রীকুমারবাবু অনুচ্চ কণ্ঠে 'স্কলার জিপসি' পড়িয়ে চলেছেন। দীর্ঘ শব্দ বহুল দীর্ঘায়িত বাক্য অনায়াস-ধারায় উচ্চারিত হচ্ছে। অনার্সের ছেলেরা সব কথা টুকে নিচ্ছে— আর বাকি আমরা হয়তো বইয়ের মার্জিনে লিখছি দুএকটা বাছাই করা ব্যাখ্যান। রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড-এর মত দেখতে অধ্যাপক বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায় দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত করে বরাভয় দিতে দিতে ক্লাসে আসছেন এবং ম্যাকবেথের মত অতিনাটকীয় রচনাকে সম্পূর্ণ অনাটকীয়ভাবে

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

বিশ্লেষণ করছেন। বাংলার ক্লাসে অধ্যাপক শিবদাস ভট্টাচার্য তাঁর সুললিত কণ্ঠে 'বৃত্র সংহার'-এর মত শুষ্ক কাব্যকেও সরস করে তুলেছেন। অধ্যাপক হেমচন্দ্র সেন ত্রিকোণমিতির ক্লাসে আমাদের দিকে পিছন ফিরে বোর্ডে অঙ্ক কষছেন এবং শেষ পর্যন্ত পৌঁছান মাত্রই সব লেখা মুছে দিয়ে নতুন অঙ্ক ধরছেন। এরকম অজস্র স্মৃতি মনের মধ্যে ভিড় করে আসে। এর কাহিনী লিখে শেষ করা যায় না।

পরিশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমি আমার শিক্ষকদের কাছে খুব ঋণী, কিন্তু তার চেয়ে বেশী ঋণী আমার সহাধ্যায়ীদের কাছে। তীক্ষ্ণ দীপ্তিমান সব বন্ধু, তারা একই সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সহযোগী। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা পরস্পরকে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে যে সাহায্য করত সেটা অন্য কোথাও দুষ্প্রাপ্য ছিল। বিশিষ্ট শিক্ষক এবং বিশিষ্ট ছাত্রের মণিকাঞ্চন যোগই ছিল এই কলেজের বৈশিষ্ট্য। বহু বছর পরে আমার অধ্যাপক জীবনেও এই বৈশিষ্ট্য অব্যাহত ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের এই চরিত্র কোনো দিন নষ্ট হবে না এই আশা নিয়ে আমরা বেঁচে আছি। ব্যক্তিরই হোক আর প্রতিষ্ঠানেরই হোক, চরিত্রহননের চেয়ে বড় পাপ আর কিছু নেই।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073